ইতিহাসের আয়নায়
ভবিষ্যতের দর্পণে

বর্তমান মুসলিম উম্মাহ

ড. ইসরার আহমাদ

ইতিহাসের আয়নায় ভবিষ্যতের দর্পণে

বর্তমান মুসলিম উম্মাহ

ইফতেখার সিফাত
অনূদিত ও পরিমার্জিত

সম্পাদনা
আব্দুল্লাহ বিন বশির

চেতনা প্রকাশন

বই : বর্তমান মুসলিম উম্মাহ
ইতিহাসের আয়নায় ভবিষ্যতের দর্পণে
লেখক : ড. ইসরার আহমাদ
অনুবাদক : ইফতেখার সিফাত
প্রকাশকাল : ইসলামি বইমেলা ২০২৩
প্রকাশনা : ৩৩
প্রচ্ছদ : আহমাদুল্লাহ ইকরাম
বানান ও সজ্জা : সাহিত্যসারথি
প্রকাশনায় : চেতনা প্রকাশন
দোকান নং : ২০, ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
পরিবেশক : মাকতাবাতুল আমজাদ, মোবাইল : ০১৭১২-৯৪৭৬৫৩
অনলাইন পরিবেশক : উকাজ, রকমারি, ওয়াফিলাইফ, নাহাল, সমাহার, পরিধি

মুদ্রিত মূল্য : ১৯৩ টাকা মাত্র

Bortoman Muslim Ummah by Dr Israr Ahmad
Published by Chetona Prokashon.
e-mail : chetonaprokashon@gmail.com
website : chetonaprokashon.com
phone : 01798-947 657; 01303-855 225

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি ৭

অনুবাদকের কথা ৯

ভূমিকা ১৫

মুসলিমজাতির উত্থান-পতনের দুই যুগ (বনি ইসরাইলের ইতিহাসের আলোকে) ২৩

ঐতিহাসিক চিত্র ২৫

কেন আজ আমরা লাঞ্ছিত ৩৩

খোদায়ি শাস্তির কুরআনিক নীতি ৪০

পূর্ববর্তী এবং বর্তমান মুসলিমজাতি ৪৯

বিংশ শতাব্দী : পূর্ববর্তী ও বর্তমান মুসলিম উম্মাহ ৫৭

ইবরাহিমি ধর্মের 'তিনের তৃতীয়' সালিসু সালাসাহ ৭০

ভবিষ্যতের কাল ৮৩

বিশ্বব্যাপী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়া ৯১

পূর্বের আলোচনার সারাংশ ৯৯

হিজরি পঞ্চদশ শতাব্দী : আশা-আশঙ্কা ১০৫

দুটি সংশয় ও তার নিরসন ১১৯

উপসাগরীয় যুদ্ধ : যুদ্ধের গোড়া ১২৫

লেখক পরিচিতি

ড. ইসরার আহমাদ ভারতের হারিয়ানা নামক জেলায় ১৯৩২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দাদা হাফেজ নুরুল্লাহ ছিলেন ১৮৫৭ সালের সিপাহি যুদ্ধের পরোক্ষ সৈনিক। মা ছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর বংশধর। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় পিতার সাথে পাকিস্তান চলে আসেন। ব্রিটিশ ভারতে তিনি মেট্রিক সমাপন করেন। হাইস্কুলে থাকতে তিনি এরাবিক গ্রামারসহ আরবি ভাষায় ভালো দক্ষতা অর্জন করেন। পরে পাকিস্তানে এমবিবিএস সমাপন করার পর লাহোর ভার্সিটিতে ইসলামিয়্যাত নিয়ে মাস্টার্স করেন।

মেট্রিকের সময় তিনি মাওলানা মওদুদির কিছু বই পড়ে তার চিন্তা ও গবেষণার প্রতি মুগ্ধ হয়ে পড়েন। আরও যাদের মাধ্যমে তিনি প্রভাবিত হন, তারা হলেন, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রহ., শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান, আল্লামা ইকবাল, আমিন আহসান ইসলাহি, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

পাকিস্তানে এসে তিনি জামায়াতে ইসলামিতে যোগ দেন। অসম্ভব মেধা ও যোগ্যতার কারণে তিনি অল্পবয়সে জামায়াতে ইসলামির রোকন হন।

ড. ইসরার আহমাদ বৈপ্লবিক চিন্তার মানুষ ছিলেন। পাকিস্তানে এসে মাওলানা মওদুদি যখন আওয়াজ তুললেন এই বলে, 'পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে ইসলামের নামে। সুতরাং এখানে আইন ও বিধান চলবে ইসলামের।' তখন ইসরার আহমাদ এই বৈপ্লবিক ঘোষণায় আরও প্রভাবিত হলেন। কিন্তু তিনি জামায়াতে ইসলামির বৈপ্লবিক চিন্তায় প্রভাবিত হলেও ইসলামের মৌলিক জ্ঞান ও নির্দেশনাকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে রাখতেন।

ইসরার আহমাদ প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করাকে কিছুতেই সঠিক মনে করতেন না। এই পথে কোনোভাবেই ইসলামি হুকুমত কায়েম করা যাবে না বলে তিনি বদ্ধমূল বিশ্বাস করেন। তাই জামায়াতে ইসলামি যখনই প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে, তখনই তিনি জামায়াতে ইসলামি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। জামায়াতে ইসলামির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে তিনি সংগঠনের সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর বিষয় মনে করেন। একজন রোকন হিসেবে জামায়াতে ইসলামি সম্পর্কে এই মূল্যায়ন অনেক বিজ্ঞজনের মাঝে ভাবনা সৃষ্টি করে। যেমন বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামির প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আব্দুর রহিম রহ.-এর জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয়টাও ভাবিয়ে তোলে!

১৯৭৫ সালে ড. ইসরার আহমাদ কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তানজিমে ইসলামি নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থা থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিশেষত কুরআনের প্রোগ্রামগুলো অত্যন্ত সমাদৃত হয়। বিভিন্ন গবেষণামূলক বইপত্রও প্রকাশ করে থাকে এ সংস্থা।

১৯৭৮ সালে পাকিস্তান টেলিভিশনে 'আল-কিতাব', 'আলিফ লাম মিম', 'রাসুলে কামিল' ও 'উম্মুল কিতাব' নামে ইসলামি প্রোগ্রাম শুরু করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত Qtv I Peace TV-তে তার প্রদত্ত কুরআনের দরস বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। কুরআনের খেদমতের স্বীকৃতিস্বরূপ পাকিস্তান সরকার তাকে 'সিতারায়ে ইমতিয়াজ' খিতাবে ভূষিত করে।

ইউটিউবে ইসরার আহমাদের শত শত ভিডিও আছে বিভিন্ন বিষয়ে। বিশেষত কুরআনের তাফসির। ৩০ পারা কুরআনের ভাগ ভাগ করা ভিডিও থেকে যেকোনো স্তরের মানুষ উপকৃত হতে পারে। খেলাফত, জিহাদ, কিতাল, কেয়ামত নিয়ে তার লেকচারগুলো অসাধারণ মুগ্ধকর। সিরাত, তাফসির, ফিকহ, মানতিক বিষয়ে তার বিস্তর অধ্যয়ন ছিল। জাগতিক জ্ঞানের পাশাপাশি আলিমানা আন্দাজে তার ইসলামিক জ্ঞান অবাক করার মতো। অবশ্য ২০২২ সালে ইউটিউব কর্তৃপক্ষ ইসরার আহমাদ সাহেবের অফিসিয়াল চ্যানেলটিকে রিমুভ করে দেয়।

ড. ইসরার আহমাদ মাওলানা মওদুদির রচনায় প্রভাবিত হলেও আদর্শের ক্ষেত্রে আইডল মানতেন শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি রহিমাহুল্লাহকে। তাত্ত্বিকভাবে তিনি আল্লামা ইকবালকে সবসময় সামনে রাখতেন।

পাকিস্তানের উলামায়ে কেরামের সাথে ইসরার আহমাদের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। বিশেষত আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরি রহ.-এর সাথে। তার কোনো এক কিতাবে বিন্নুরি সাহেবের ভূমিকাও আছে। ইসরার আহমাদ সম্পর্কে পাকিস্তানের গ্রান্ড মুফতি আল্লামা রফি উসমানি রহিমাহুল্লাহরও মূল্যায়ন আছে। তানজিমে ইসলামি কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনারে আল্লামা নিজামুদ্দিন শামজায়ি রহিমাহুল্লাহর মতো ব্যক্তিত্বেরও উপস্থিতি দেখা যেত।

২০১০ সালের ১৪ এপ্রিল তিনি মারা যান। তার জানাজার ভিডিওতে দেখা যায় পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শাইখ শহিদ সামিউল হক হক্কানি রহ.।

আল্লাহ শাইখ ইসরার আহমাদ রহিমাহুল্লাহকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করুন।

[সংক্ষিপ্ত এই জীবনীটি মুহতারাম মাওলানা মিযানুর রহমান ইবনে আলি সাহেবের রচনা থেকে ঈষৎ পরিমার্জনের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে।]

অনুবাদকের কথা

১। আমরা এখন একবিংশ শতাব্দীতে বসবাস করছি। এই শতাব্দী মুসলিম উম্মাহ এবং পুরো বিশ্বের রাজনীতির জন্যই একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে চিহ্নিত বিশ্লেষকদের কাছে। এই শতাব্দীতে আমরা মুসলিম উম্মাহর মাঝে পতন ও জাগরণ দ্বিমুখী দুটি প্রবণতাই দেখতে পাচ্ছি। তবে এ কথা আশা নিয়ে বলাই যায় যে, একবিংশ শতাব্দী মুসলিমদের বিজয়ের শতাব্দী। এই শতাব্দীতে মুসলিমরা দুনিয়াতে আবারও তাদের সোনালি শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনবে। উপনিবেশ আমলের পর থেকে রাজনৈতিক, আদর্শিক, সাংস্কৃতিক ও শারীরিক যে নিগ্রহের শিকার মুসলিমজাতি হয়ে আসছে, সেখান থেকে মুসলিম উম্মাহ ঘুরে দাঁড়াবে।

উসমানি খিলাফার পতনের ১০০ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। মাঝখানের দীর্ঘ সময়টাতে মুসলিমজাতি ইসলামি শরিয়ার ছায়াতলে জীবনযাপন করার নেয়ামত থেকে সামগ্রিকভাবে বঞ্চিত হয়ে আছে। কিন্তু পতনের ১০০ বছর পূর্তি হওয়ার আগাম সময়টাতেই আমরা দুনিয়ার বুকে কিছু ভূখণ্ডে ইসলামি শরিয়ার সুশীতল শাসনের ঝলক দেখতে পাচ্ছি। বর্তমান প্রজন্মের মুসলিমদের জন্য যা একটি আশাব্যঞ্জক বিষয়। তবে এই পরিবর্তন ও জাগরণ সহসা সহজেই ঘটবে না, আপনা-আপনিই ঘটে যাবে না। বরং এর জন্য বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন হবে। দরকার হবে মুসলিম উম্মাহর উৎসর্গ ও কুরবানির নজরানা পেশ করা।

২। বর্তমান সময়ের ব্যাপারে একটি বাস্তবতা হলো, এটি ফিতনার জামানা। এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আমরা ফিতনার জামানায় বসবাস করছি। আমাদের আকাবিরদের মধ্য থেকেও হজরত মানাজির আহসান গিলানি এবং আবুল হাসান আলি নদবি রহিমাহুমাল্লাহু আধুনিক পশ্চিমা বস্তুবাদী ও পুঁজিবাদী সভ্যতাকে দাজ্জালি ফিতনা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে নববির ভান্ডারে যেসব ফিতনার কথা বলে গেছেন, তার অধিকাংশই আজ আমাদের সামনে বর্তমান। সুদি অর্থনীতি আর কারবারে গোটা সমাজব্যবস্থা এমনভাবে ছেয়ে আছে, কেউ ইচ্ছা করলেও এর স্পর্শ থেকে বেঁচে থাকতে পারছে না।

অশ্লীলতার নিত্যনতুন পন্থা আর প্রকৃতি আবিষ্কৃত হচ্ছে। হারাম রিলেশন, পরকীয়া, জিনা, ফ্রি মিক্সিং, বেপর্দা, অশালীন পোশাক, নারীদেহ ও সৌন্দর্যপ্রদর্শনী, সমকামিতা, গানবাদ্য, নেশা, মদ্যপানসহ অশ্লীলতার এমন কোনো ধরন নেই, যা আধুনিক সভ্যতায় বৈধ, সাধারণ বিষয় আর অধিকারে রূপ নেয়নি। সমাজের পুরো কালচারই নির্ভর করছে যৌন উন্মাদনার ওপর। ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধের সীমা আজ চূর্ণবিচূর্ণ। প্রবৃত্তি, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও বিশ্বমোড়লদের নির্ধারিত সীমারেখা আজ আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার ওপর আধিপত্য করছে।

পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি সবকিছু আজ দ্বীনশূন্য। ইহুদিবাদী বিশ্বব্যবস্থার তৈরি নানা মতবাদ দ্বীনের জায়গা দখল করে নিয়েছে। মানুষ অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ, রাষ্ট্রনীতিতে সেকুলারিজম, ব্যক্তিগত জীবনাচারে লিবারেলিজম—এভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামকে বাদ দিয়ে পশ্চিমাদের তৈরি বিভিন্ন মতবাদকে গ্রহণ করে নিয়েছে। পুরো বিশ্বসভ্যতার ওপর আজ দাজ্জালের দোসর ইহুদিবাদীদের রাজত্ব আর আধিপত্য কায়েম হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর বিগত ১৪ বছরের ইতিহাসে এরকম পরিস্থিতি কখনোই আসেনি।

ফলে আধুনিক এই বিশ্বকাঠামো পুরো বিশ্ববাসীর জন্যই নতুন এক অভিজ্ঞতা। উক্ত অভিজ্ঞতা আমাদেরকে এই বার্তাই দিচ্ছে যে, আমরা ফিতনাময় ইহুদিবাদী এক বিশ্বব্যবস্থায় বসবাস করছি। ইহুদিরা হলো দাজ্জালের প্রধান অনুচর। তারাই দাজ্জালের আগমনের পথকে প্রস্তুত করবে এবং তারাই এই বিশ্বমঞ্চকে দাজ্জালের জন্য সাজিয়ে তুলবে।

এই ইহুদিজাতির সাথে মুসলিমজাতির ঐতিহাসিক সম্পর্ক আছে। তারাই ছিল পূর্ববর্তী মুসলিমজাতি। কিন্তু সবশেষে ঈসা আলাইহিস সালামের শরিয়তের সাথে শত্রুতা এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

নবুয়তকে অস্বীকৃতির মাধ্যমে তারাই হয়ে গেল বর্তমান মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় শত্রু। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾

যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি মানুষের মধ্যে ইহুদি ও মুশরিকদেরকে তুমি অবশ্যই সবচেয়ে বেশি শত্রুতাপরায়ণ দেখতে পাবে। (সুরা মায়েদা, আয়াত ৮২)

ইহুদিরা বনি ইসরাইলের বংশধর। বনি ইসরাইলের সাথে বিভ্রান্তিগত দিক থেকেও মুসলিম উম্মাহর এক গভীর সম্পর্ক আছে। যা বিভিন্ন হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি। হাদিসের মূল মর্ম হলো, বনি ইসরাইলের ভেতর যেসব বিভ্রান্তি দেখা গিয়েছিল, বর্তমান মুসলিম উম্মাহও সেগুলোতে লিপ্ত হবে। বনি ইসরাইল যেমন নানা দলে বিভক্ত হয়েছিল, বর্তমান মুসলিম উম্মাহও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হবে।

মূলত ড. ইসরার আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হাদিসের উক্ত মর্মবাণীকেই এই বইয়ের মূল ভিত্তি হিসেবে সামনে রেখেছেন। তিনি হাদিসের উক্ত মর্মবাণীর আলোকে ইহুদিজাতি এবং বর্তমান মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ইতিহাসের কিছু মিলের দিক আলোচনা করেছেন। তুলে ধরেছেন বর্তমান খ্রিষ্টানজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। সেইসাথে হাদিসে নববির ভান্ডার থেকে ফিতনের হাদিসসমূহের আলোকে মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আলোকপাত করেছেন। পুরো বিশ্বব্যাপী আবারও খিলাফাতে ইসলামিয়াহ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও আশা ব্যক্ত করেছেন।

৩। ফিতান সম্পর্কে জ্ঞানলাভ, অনুসন্ধান, গবেষণা এবং নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি সতর্কতার দিক উল্লেখ করা এখানে জরুরি মনে করছি। ফিতান সম্পর্কিত অনেক হাদিস আছে, যেগুলোতে বিভিন্ন কাজ ও প্রবণতার কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন সুদ, অশ্লীলতা, মদ, গানবাদ্য ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া। এসব ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি এসব হাদিসকে প্রয়োগ করতে পারি এবং এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি কর্তৃপক্ষ, ব্যবস্থাপনা, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও সংস্কৃতির ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করতে পারি।

আবার ফিতানসংক্রান্ত কিছু হাদিস আছে, যেগুলো নির্দিষ্ট ঘটনাপ্রবাহের সাথে সম্পৃক্ত। এসব হাদিসের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ ও সালফে সালেহিনের নিরাপদ পন্থা হলো, হাদিসের বাহ্যিক মর্মের সাথে পরিপূর্ণ না মিললে সুনিশ্চিতভাবে কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার ওপর সেগুলোকে প্রয়োগ না করা এবং সেগুলোর রূপক অর্থ বের করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করা। কারণ এগুলো গাইবের সংবাদ। এগুলোর প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহর কাছেই আছে। অতীতে অনেকেই এই ক্ষেত্রে অনেক বাড়াবাড়ি করেছেন এবং কয়েক যুগ পার হতেই তাদের এই বাড়াবাড়ি দিবালোকের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, এই ধরনের হাদিসগুলো আমাদের পাঠে থাকতে হবে এবং যুগ সম্পর্কেও সচেতনা লাভ করতে হবে। আমরা সুনির্দিষ্টভাবে হাদিসকে প্রয়োগ না করেও হাদিসের সম্ভাব্যতা অনুযায়ী মানুষকে সতর্ক করতে পারি। মানুষকে অবগত করতে পারি যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে এরকম কিছু ঘটার কথা বলেছেন। ফলে আমাদের সর্বদা এই ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

তা ছাড়া রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ফিতানের হাদিস ছাড়াও আমরা জিয়োপলিটিক্সের জ্ঞানের আলোকে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করতে পারি এবং করণীয় সম্পর্কে দিগনির্দেশনা দিতে পারি। এখানে ফিতানের হাদিসকেই জোর করে এনে ফিট করতে হবে, এমন মানসিকতা নিরাপদ নয় এবং বিশুদ্ধও নয়।

উম্মাহর জন্য পালনীয় আহকামসমূহ ফিতানের হাদিসের ওপর নির্ভরশীল নয়। উদাহরণস্বরূপ জিনার কথা আমরা বলতে পারি। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী ফিতনার সময় জিনা বৃদ্ধি পাবে। এখন আমাদের জন্য জিনা থেকে বিরত থাকার আবশ্যকীয়তা কি এই কারণে তৈরি হবে যে, এটি ফিতনার জামানার আলামত হিসেবে এসেছে? নাকি ফিতনার আলামত ছাড়াই স্বতন্ত্র শরয়ি নির্দেশনা অনুযায়ী জিনা থেকে আমাদের জন্য বিরত থাকা ওয়াজিব? অবশ্যই স্বতন্ত্র শরয়ি নির্দেশনার মাধ্যমে জিনা সর্বকালেই নিষিদ্ধ। এটা রাসুলের জামানায় হোক কিংবা সাহাবাদের জামানায়, খাইরুল কুরুনের সময়

হোক কিংবা ফিতনার সময়। হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে ফিতানের হাদিসগুলো আমাদের অন্তরে এক্সট্রা এক ধরনের ভীতি ও সচেতনতা সৃষ্টি করে।

একই কথা বৈশ্বিক ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জিয়োপলিটিক্সের ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ীই আমরা স্বতন্ত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ণয় করতে পারি। ধরুন ভারতে মুসলিমদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে আবার আরবের কোনো দেশেও মুসলিমদের নির্যাতন করা হচ্ছে। এখন ভারতবর্ষের ব্যাপারে হাদিসে গজওয়াতুল হিন্দের কথা এসেছে। আর আরবের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো ফজিলতের কথা আসেনি। এখন কেবল গজওয়াতুল হিন্দের হাদিসের কারণেই কি আমাদেরকে ভারতের ঘটনাপ্রবাহের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে, নাকি শরিয়তে ইসলাম ও উম্মাহর প্রতি আমাদের মৌলিকভাবে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য দিয়েছে সেই জায়গাটিকেই সচেতনার প্রধান কারণ বানাতে হবে? বা ধরুন হাদিসে হিন্দের যুদ্ধ নিয়ে কোনো কথাই আসেনি। এখন এজন্য কি ভারতের ঘটনাপ্রবাহের ব্যাপারে আমাদের সচেতনতা ও দায়িত্ব-কর্তব্য বলে কিছুই থাকবে না? এই ক্ষেত্রে আমাদের সচেতনতার ভিত্তি যদি শরয়ি মৌলিক দায়িত্ব না হয়ে কেবল গজওয়াসংক্রান্ত হাদিস হয়, তাহলে উল্লিখিত দৃষ্টান্তে আরবের মুসলিমদের নির্যাতনের ব্যাপারে আমাদের সচেতনা আসবে না। যা ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক।

আলোচনা লম্বা হয়ে যাচ্ছে। আর দীর্ঘ করতে চাচ্ছি না। আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, নির্দিষ্ট ঘটনাপ্রবাহের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসসমূহ নিয়ে আমরা চর্চা করব না। অবশ্যই সেগুলো আমাদের সামনে থাকতে হবে এবং সকল ধরনের ফিতানের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি আমাদের রাখতে হবে। কিন্তু প্রথমত আমরা এসব হাদিসকে সুনিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট কোনো ঘটনার ওপর প্রয়োগ করব না ও জোর করে এগুলোর দূরবর্তী কাল্পনিক রূপক মর্ম টেনে বের করতে যাব না। দ্বিতীয়ত মানুষের ভেতর ফিতান সম্পর্কিত নসিহাকেই সচেতনার মূল ভিত্তি বানাব না। বরং সেগুলো উপযুক্ত স্থানে বর্ণনা করলেও মৌলিক শরয়ি দায়িত্ববোধের চেতনাকে সর্বাগ্রে তাদের দিলে স্থাপন করার চেষ্টা করব।

মূলত এই বইটির কাজ করার ক্ষেত্রে আমার একটি চিন্তা এটাও ছিল যে, যেন ফিতানের হাদিসসমূহের জিয়োপলিটিক্স-ভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে সরাসরি সংশ্লিষ্ট হাদিসকে প্রয়োগের বিভ্রান্তির দিকটি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয় এবং এর একটি দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে উপস্থাপিত থাকে। কারণ ড. ইসরার আহমাদ রহিমাহুল্লাহ আশির দশকে ফিতানের সময়কার ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে কিছু হাদিসের এমন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, বর্তমান সময়ে জীবিত থাকলে তিনি এই ব্যাপারে লজ্জিত হতেন এবং অন্যকেও এই ধরনের প্রবণতা থেকে সতর্ক করতেন। কারণ সেই ব্যাখ্যাগুলো তখনকার বাস্তবতায় চটকদার মনে হলেও বর্তমানে হাস্যকর ও কাল্পনিক রূপকথায় পরিণত হয়েছে বলা যায়। বর্তমান সময়ে যেহেতু অনেক স্বশিক্ষিত মুসলিম ও বিভ্রান্ত গবেষকের ভেতর এই প্রবণতা বিদ্যমান আছে, তাই আশা করি এই বইটি তাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হবে নিজেদেরকে এই প্রবণতা থেকে বের করে আনার জন্য।

আশা করি বইটি আমাদেরকে উল্লিখিত সতর্কতার পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহর অতীত ও বর্তমান ঘটনাপ্রবাহের একটি সংক্ষিপ্ত ও শিক্ষণীয় চিত্রের সাথে পরিচিত করাবে এবং ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমাদেরকে আশাবাদী ও উদ্যমী করে তুলবে। মূল বইটির নাম *সাবেকা আওর মওজুদা মুসলমান উম্মাতু কা মাজি হাল আওর মুসতাকবাল* বইটির শেষের দিকে পাকিস্তানের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু অধ্যায় আছে। সেগুলো অনুবাদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

মূলত এই কাজটি আজ থেকে প্রায় দুই-আড়াই বছর আগে হাতে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সংগত কিছু কারণেই কাজটি সম্পন্ন করা ছাড়া ফেলে রাখা হয়। সর্বশেষ চেতনা প্রকাশনের কর্ণধার মাওলানা বুরহান আশরাফি ভাইয়ের আবদারে কাজটি সম্পন্ন করা হয়। যার ফলে বইটি এখন প্রকাশিত হয়ে আপনাদের সামনে হাজির। আল্লাহ তাআলা বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের খেদমতকে কবুল করে নিন এবং বইটিকে মুফিদ হিসেবে মাকবুল বানিয়ে নিন। আমিন।

ইফতেখার সিফাত

ভূমিকা

বক্ষ্যমাণ বইটি ১৯৭৪ সালের শেষের দিকে রমজান মাসে ইতিকাফ অবস্থায় লেখা হয়েছিল। ওই বছরই মাসিক 'মিসাক' নামক ম্যাগাজিনের অক্টোবর এবং নভেম্বর সংখ্যায় ধারাবাহিক ছাপা হয়। এর কিছুদিন পূর্বে লেখক ২১ জুলাই বিস্তারিত এক রচনার মাধ্যমে 'তানজিমে ইসলাম' নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই ঘোষণাপত্রের বেশিরভাগ অংশ সে বছর মাসিক 'মিসাকের' সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশ হয়েছিল। আর বাকি অংশটুকুও বিভিন্নভাবে প্রচার হয়েছিল।

১৯৭৯ সালে লেখাগুলোকে একত্র করে 'সার আফগানদেশ' নামে কিতাব আকারে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ এই কিতাব দুষ্প্রাপ্য ছিল। পুনরায় 'ইশাআতে তানজিমে ইসলামি'-এর নভেম্বরের সংখ্যা থেকে 'আজমে তানজিম' শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছিল।

এই লেখার মূল উদ্দেশ্য ছিল, বিংশ শতাব্দীর মাঝে মুসলিম উম্মাহর উত্থানে সমকালীন যেসব বিপ্লবী কাজ চলছে এবং বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দল ও সংগঠনের যেসব সংস্কারমূলক কাজ দেখা যায়, ব্যক্তিগতভাবে লেখক এবং সামষ্টিকভাবে 'তানজিমে ইসলামি'-এর কর্মপন্থা কোনটির সাথে সম্পর্ক রাখে সেটা স্পষ্ট করা। (এজন্য লেখার বড় একটা অংশ এই বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত।)

তবে যেহেতু কুরআনের ভাষায় জন্মের পূর্বে কোনোকিছুর মৃত্যু অসম্ভব এবং অকল্পনীয়। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

﴿كُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

> অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদের প্রাণ দান করেছেন, আবার মৃত্যু দান করবেন। পুনরায় তোমাদের জীবন দান করবেন। অতঃপর তারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে।[১]

তাই উম্মাহর উত্থান-পতনের ইতিহাসে আমার মনোযোগ চলে গেল। আমি সেই ইতিহাসের অলিতে-গলিতে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় বিচরণ করছিলাম। হঠাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস সামনে চলে এলো। হাদিসটি ছোট চাবি দিয়ে বিশাল খাজানা খোলার কাজ করেছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ.

> বনি ইসরাইলের সবকিছু আমার উম্মতের মাঝে পায়ে পায়ে প্রাদুর্ভাব হবে।[২]

হাদিস নামক এই চাবি মুসলিম উম্মাহর চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের সেই রহস্যভান্ডার আমার সামনে উন্মোচন করেছিল, বনি ইসরাইলের ২ হাজার বছরের ইতিহাসসংবলিত সুরা বনি ইসরাইলের প্রাথমিক কিছু আয়াতে যা লুক্কায়িত ছিল।

শুধু আল্লাহর নেয়ামতের স্মরণ ও বর্ণনাস্বরূপ বলছি, এই সুরার অন্তর্নিহিত রহস্যগুলোর মাধ্যমে তিন দিক থেকে আমি নিজ ঈমান ও বিশ্বাসের গভীর উন্নতি উপলব্ধি করেছি।

প্রথমত, আমার অন্তরে কুরআনের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত এই বিষয়ে আমার অগাধ বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে, যা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিস শরিফে বলে গেছেন।

فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ.

---

১. সুরা বাকারা, আয়াত ২৮
২. জামিউত তিরমিজি, ২৬৪১

> কুরআনের মাঝে তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের ঘটনা এবং বর্তমানের নির্দেশনা রয়েছে।[৩]

দ্বিতীয়ত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ। এর মাঝে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কতই-না মূল্যবান হীরা আর সুন্দর মতি সুপ্ত আছে।

তৃতীয়ত, কুরআন ও হাদিসের পারস্পরিক অভূতপূর্ব সম্পর্ক অনুভূত হলো। শরিয়তের বিধিবিধানের মাঝে কুরআন ও সুন্নাহর পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটি তো সবার কাছেই স্বীকৃত। সাথে সাথে কুরআনের জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং অবগতি-পরিচিতির যে ভান্ডার, রাসুলের ছোট ছোট বাণীগুলো সেই ভান্ডারের চাবিকাঠি বলা যায়।

এই গভীর অনুভূতিগুলোর সাথে যখন কলমে কালির স্রোত এলো, তখন সেই প্রবাহে কলমের কালি ব্যতিক্রম কিছু বুনন করল। প্রায় ১৬ বছর পর নজরে সানির (পুনর্দৃষ্টি) উদ্দেশ্যে যখন নিজেই পড়তে শুরু করলাম, হতবাক হলাম। হায় রব, এমন স্ফুলিঙ্গ আমার ছাইয়ের মধ্যেও ছিল!

কারণ এর মাধ্যমে মুসলিমজাতির ১৪ হাজার বছরের সামগ্রিক চিত্র সংক্ষিপ্তাকারে কয়েক পৃষ্ঠার মাঝে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে বলে আমি মনে করি। যা জানা সমাজ সংস্কারের এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার স্বপ্নচারী প্রত্যেক সদস্যের জন্য তো আবশ্যকই বটে, সাধারণ মুসলমানদের জন্যও অনেক উপকারী।

আমার আলোচনায় মুসলিমজাতির ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের বর্ণনা দিতে বনি ইসরাইলের কথা এসেছে। এর বিশেষ গুরুত্ব ও উপকারিতার কথা বিবেচনা করে বনি ইসরাইলের একটি ঐতিহাসিক চিত্র পরিশিষ্ট আকারে যোগ করে দিয়েছি।

আমি কেবল পরিশিষ্টের শিরোনামগুলো তৈরি করেছি। বাকি সব তথ্য-উপাত্ত মরহুম সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদি[৪] রচিত 'তাফহিমুল কুরআন'-এর সেসব বিশ্লেষণধর্মী টীকা থেকে গৃহীত যেগুলো তিনি উক্ত তাফসিরের

---

৩. জামিউত তিরমিজি, ২৯০৬; সুনানে দারেমি, ৩৪৩৪

৪. মরহুম আবুল আলা মওদুদি সাহেবের সাথে মৌলিক কিছু বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর মতবিরোধ আছে। উম্মাহর জন্য তাঁর ত্যাগ ও কুরবানিকে স্বীকার করে আল্লাহর কাছে তাঁর মাগফেরাত কামনা করি।

দ্বিতীয় খণ্ডে সুরা বনি ইসরাইলের প্রথম রুকুর অধীনে সংযোজন করেছেন।[৫]

আশা করি, দুটি জাতির তুলনামূলক অধ্যয়নের মাধ্যমে আগ্রহী পাঠকদের সামনে মুসলিমজাতির গঠন ও প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি এবং তার উত্থান-পতনের কারণসমূহ স্পষ্ট হয়ে যাবে। গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলোর আলোকে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের দর্শন এবং তার জ্ঞান ও বাস্তবতার দরজা উন্মোচিত হবে পাঠকের সামনে ইনশাআল্লাহ। এরই ধারাবাহিকতায় আমি কিছু অতিরিক্ত পয়েন্ট খুব সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরছি। যেগুলো ভালো করে বোঝা এবং চিন্তা করা দরকার।

১. মুসলমানদের জাতি গঠনের একমাত্র ভিত্তি আল্লাহর কিতাব, এজন্যই বনি ইসরাইলের ঐতিহাসিক সূচনা তাওরাতের বরাতে করা হয়েছে। আর উম্মতে মুসলিম হিসেবে তাদের সমাপ্তি এবং এক নতুন উম্মতে মুসলিমাহ তথা উম্মতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোষণা কুরআনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে।

২. উম্মতে মুহাম্মদকে উভয় কিবলার দায়িত্বশীল বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এজন্য সুরা বনি ইসরাইলের সূচনা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেরাজের প্রথম ভাগ তথা মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরের বর্ণনা দিয়ে করা হয়েছে।

৩. কুরআনিক শিক্ষার মূল হচ্ছে তাওহিদ। তাওহিদের সারাংশ হলো, আল্লাহ ছাড়া আর কারও ওপর ভরসা না করা। তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করো না।[৬]

৪. উম্মতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্থান নবিযুগ থেকেই শুরু হয়েছিল। রাসুলের হাতেই আল্লাহ তাআলা এই আন্দোলনের পূর্ণতা দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী উম্মতের প্রাথমিক উত্থান তাদের রাসুল অর্থাৎ হজরত মুসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁকে

---

৫. লেখকের লিখিত গ্রন্থ ইসতিহকামে পাকিস্তানের নবম অধ্যায়েও বিষয়গুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হয়েছে।

৬. সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ২

কিতাব প্রদানের প্রায় ৩০০ বছর পর শুরু হয়েছে। বনি ইসরাইলের ভীরুতার কারণে মুসা আলাইহিস সালামের জীবদ্দশায় তাঁর বিপ্লব পূর্ণতা পায়নি।[৭] সুরা বনি ইসরাইলের প্রথম রুকুতে ইতিহাসের এই অংশের কথা নেই।

৫. পতনের সূচনাস্বরূপ উভয় উম্মতই দুটি স্তরের মুখোমুখি হয়েছে। বনি ইসরাইলের ওপর প্রথমে পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে ব্যাবিলনের সম্রাট বুখতে নসরের হামলা এবং দ্বিতীয়বার রোমের সম্রাট তিতাউসের আক্রমণ।

আর মুসলমানদের ওপর প্রথমে পশ্চিম-উত্তর দিক থেকে ক্রুসেডারদের হামলা এবং দ্বিতীয়বার পূর্ব দিক থেকে তাতারদের আক্রমণ।

৬. পূর্ববর্তী উম্মত শুধু একটি জাতি তথা বনি ইসরাইলের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। এজন্য তাদের মাঝে সমস্ত সংস্কারবিপ্লব বনি ইসরাইলের হাতেই হয়েছে। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদ মৌলিকভাবে দুই জাতির মাঝে বিস্তৃত। আরব, অনারব। এজন্য এই উম্মতের মাঝে 'অন্য জাতি দিয়ে পরিবর্তন'[৮]-এর ওপর আমল হয়েছে এবং দ্বিতীয় উত্থান আরব নেতৃত্বের বাহিরে তুর্কিদের নেতৃত্বে হয়েছে।

---

৭. এই কথা থেকে এই ধারণা করার সুযোগ নেই যে, মুসা আলাইহিস সালাম তার দাওয়াত ও দায়িত্ব পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারেননি। এখানে উদ্দেশ্য হলো, মুসা আলাইহিস সালাম তার দায়িত্ব পূর্ণতায় পৌঁছালেও বনি ইসরাইলের অবাধ্যতার কারণে তারা হজরত মুসা আলাইহিস সালামের জীবদ্দশাতেই একটি বড় দল আসমানি শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে যায়। মুসা আলাইহিস সালামের জীবদ্দশাতেই বনি ইসরাইলের সে অবাধ্যতার চিত্র কুরআনে এভাবে চিত্রায়িত হয়েছে,

﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۘ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾

আর মুসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে তাদের অলংকার দ্বারা একটি বাছুর বানাল, (বাছুরটি ছিল) একটি (প্রাণহীন) দেহ, যা থেকে গরুর মতো ডাক বের হচ্ছিল। তারা কি এতটুকুও দেখল না যে, তা না তাদের সাথে কথা বলতে পারে আর না তাদেরকে কোনো পথ দেখাতে পারে। (কিন্তু) তারা সেটিকে (উপাস্য) বানিয়ে নিল এবং (নিজেদের প্রতিই) জুলুমকারী হয়ে গেল। (সুরা আরাফ : ১৪৮) (সম্পাদক)

৮. সুরা মুহাম্মদ, ৩৮ আয়াতের মূল পাঠ হলো,

﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾

৭. উভয় উম্মতের দ্বিতীয় এবং দীর্ঘতর পতন ইউরোপীয়দের হাতে হয়েছে। বনি ইসরাইলের দ্বিতীয় পতন রোমানদের হাতে আর মুসলমানদের দ্বিতীয় পতন হয়েছে ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইতালি, নিউজিল্যান্ডসহ অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর হাতে।

৮. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য শেষবারের মতো আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে আসার সুযোগ তৈরি হয়েছিল। এই সুযোগটাকে তারা নিজেদের আমলের মাধ্যমে হাতছাড়া করেছে। তাদের দ্বিতীয় পতনের সময়কাল এখনো পর্যন্ত জারি আছে। এজন্য তাদের ওপর 'যদি তোমরা করো, আমিও করব'[১]-এর শাস্তির বহিঃপ্রকাশ ধারাবাহিকভাবে চলমান। যার চাক্ষুষ প্রমাণ অর্ধশতাব্দী পূর্বে জার্মানদের আক্রমণ। যেটাকে তারা 'হলোকাস্ট' নামে ব্যক্ত করে। তাদের মূল উত্থান দাজ্জাল ও ঈসা ইবনু মারিয়াম আলাইহিস সালামের আগমনের সময়কালে হবে। যার সময় এখন খুব বেশি দূর বলে মনে হয় না। আল্লাহই ভালো জানেন।

৯. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের পর আল্লাহর রহমত প্রবেশ করার একমাত্র মাধ্যম 'কুরআনে হাকিম'। যার দিকে আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বেই বনি ইসরাইলকে রাহনুমা বা পথনির্দেশ করা হয়েছিল। বর্তমানেও মুসলমানদের পুনরুত্থানের একমাত্র পথ কুরআনের প্রতি মনোনিবেশ করা। এজন্যই সুরা বনি ইসরাইলের প্রথম রুকুর শেষ দিকে ইরশাদ হয়েছে,

﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾

যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তিনি তোমাদের স্থানে অন্য সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করবেন।

১. সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৮, আয়াতের মূল পাঠ হলো,

﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا﴾

যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, কিন্তু তোমরা যদি একই কাজের পুনরাবৃত্তি করো, তবে আমিও পুনরাবৃত্তি করব।

নিশ্চয় এই কুরআন সেই পথের সম্বল সন্ধান দেয়, যা সুপ্রতিষ্ঠিত।[১০]

এমনকি পুরো সুরার ভিত্তিই হচ্ছে, কুরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা। বিশেষত নিম্নোক্ত আয়াতটি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ।

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

আর আমি কুরআনে যা-কিছু অবতীর্ণ করেছি, তা মুমিনদের জন্য আরোগ্য এবং রহমতস্বরূপ।[১১]

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ﴾

আর আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সমস্তকিছুর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে দিয়েছি।[১২]

আর সুরার ইতিও টানা হয়েছে অত্যন্ত সাহিত্যপূর্ণ কথা দিয়ে,

﴿وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾

আর আমি তা যথাযথভাবে নাজিল করেছি এবং যথাযথভাবে তা নাজিল হয়েছে।[১৩]

তো ওপরে বর্ণিত দাবির পরিপূর্ণ ও যথার্থ মর্ম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদিসে যাওয়া যায়। তিনি বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ.

---

১০. সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৯
১১. প্রাগুক্ত, আয়াত ৮২
১২. প্রাগুক্ত, ৮৯
১৩. প্রাগুক্ত, ১০৫

আল্লাহ তাআলা এই কিতাবের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির উত্থান ঘটাবেন আবার বিভিন্ন জাতির পতন ঘটাবেন।[১৪]

১০. উম্মতে মুসলিমার তৃতীয় এবং শেষ উত্থান যার আগমনবার্তা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে, তা চূড়ান্ত ভাগ্যলিপির মতো নিশ্চিত এবং অবশ্যম্ভাবী। তবুও আমরা কুরআনের ভাষায় বলব,

﴿إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ﴾

আর আমি জানি না তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয় নিকটে না দূরে।[১৫]

এটা বলা যাবে না যে, সেই সময় কতটুকু দূরে। এর পূর্বে উম্মত কোন কোন আক্রমণের শিকার হবে এবং কী পরিমাণ বিপদ তাদের সহ্য করতে হবে সেটাও বোঝা যাবে না। তবে এটাও ঠিক যে, খুব বেশি দিন বাকি নেই। তৃতীয় এই উত্থানের পরিক্রমায় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে এবং আল্লাহ তাআলা বর্তমান নামে মাত্র মুসলমানদের হটিয়ে দিয়ে একদম নতুন কোনো জাতির হাতে দ্বীনের ঝান্ডা তুলে দেবেন। (আল্লাহর জন্য তা কঠিন কিছু নয়)।

ড. ইসরার আহমাদ
১৯/২/১৯৯১

---

১৪. সহিহ মুসলিম, ১৭৮২
১৫. সুরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৯

কেন আজ আমরা লাঞ্ছিত

১৯৯৩ সালের ২২ জানুয়ারি নিউ জার্সি টাউনের শিল্পনগরীতে জুমার খুতবার জন্য ভাবছিলাম। হঠাৎ বিজলির মতো একটি বাস্তবতা মাথায় এলো। সুরা বাকারার ৬১ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ﴾

> আর তাদের ওপর আরোপ করা হয়েছে লাঞ্ছনা ও দরিদ্রতা এবং তারা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হলো।[২২]

খুব সহজেই আমরা এই আয়াতটি পড়ে ফেলি। নিজেদের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকি এই ভেবে যে, আয়াতটি তো ইহুদিদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু যদি বর্তমান অবস্থাকে সামগ্রিকভাবে পাঠ করা হয়, তাহলে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, বিদ্যমান বাস্তবতায় এই আয়াতের চিত্র শুধু ইহুদিদের ওপর নয়, মুসলিমজাতির ওপরও প্রয়োগ হয়। সুরা আলে-ইমরানের ১১২ নম্বর আয়াতেও বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। এমনইভাবে সুরা ফাতিহার শেষ আয়াতের তাফসিরের ব্যাপারে মুফাসসিরে কেরামদের ইজমা রয়েছে যে,

مغضوب عليهم—'ক্রোধের শিকার'-এর কার্যত উদ্দেশ্য হলো ইহুদিজাতি।

আর ضالين—'পথভ্রষ্ট'-এর উদ্দেশ্য হলো খ্রিষ্টানজাতি।

বর্তমান বাস্তবতা হলো, নিশ্চিতভাবে এখনো খ্রিষ্টানরা গোমরাহ। কিন্তু 'মাগদুবি আলাইহিম'-এর অবস্থাগত চিত্রে শুধু ইহুদিরা নয়, মুসলমানরাও আছে। চিন্তা করে দেখুন! বর্তমানে পুরো পৃথিবীতে ইহুদিদের মোট সংখ্যা হলো ১৫ মিলিয়ন অর্থাৎ দেড় কোটি। আর মুসলমানদের সংখ্যা অন্তত পক্ষে

---

২২. সুরা বাকারা, আয়াত ৬১

১৯০ কোটি। মুসলমানরা ইহুদিদের থেকে প্রায় ১০০ গুণ বেশি। তারপরেও জমিনের রাজনৈতিক সিংহাসন ইহুদিদের হাতে। এজন্য তারা দুনিয়ার এক সুপ্রিম পাওয়ার তথা আমেরিকার রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতি সর্বত্রই প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। আমেরিকার প্রধান হোক কিংবা সিনেট, কংগ্রেস হোক কিংবা পেন্টাগণ, সব জায়গাতেই তাদের প্রভাব বিদ্যমান। বিশেষত প্রচারমাধ্যম পরিপূর্ণই তাদের নিয়ন্ত্রণে। অন্যদিকে সোনা-রুপার পরিবর্তে কাগুজে মুদ্রার প্রচলন এবং ব্যাংক ইন্সুরেন্স ও স্টক এক্সচেঞ্জের জাল বিছিয়ে দুনিয়ার মোট সম্পদের এক বিশাল অংশ ইহুদিদের কবজায় চলে এসেছে। সুতরাং একদিকে তাদের মাঝে ২৪ জন সদস্য এমন রয়েছে, যারা কয়েক বিলিয়ন ডলারের চেক জারি করে দিতে পারে। অপরদিকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণক্ষমতাও তাদের হাতে। তারা যখন যেখানে ইচ্ছা অর্থনৈতিক মন্দা তৈরি করে দুনিয়ার বড় বড় শক্তিগুলোকে শায়েস্তা করতে পারবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থা তো আমাদের সামনেই বিদ্যমান। চীনও এটা অনুভব করছে যে, আমেরিকা তার পথে বাধা হচ্ছে। একই কাণ্ড তারা আমেরিকার সাথেও করতে পারে এবং হয়তো সেটা বেশি দূরে নয়। আল্লাহই ভালো জানেন![২৫]

ইহুদিদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি কিছুটা গোপন এবং সাধারণ মানুষদের অজানা। কিন্তু মুসলিমজাতির সামনে তো এই বাস্তবতা 'সূর্যের

---

২৫. সামনে লেখক বিভিন্ন জায়গায় ইহুদিদের শক্তি ও বর্তমান পৃথিবীতে তাদের দাপটের কথা উল্লেখ করবেন। সে আলোচনাগুলো পড়ার আগে ইহুদিদের বিষয়ে একটি বিষয়ে একটি প্রশ্নের উত্তর জেনে রাখা দরকার। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ চিরস্থায়ীভাবে ইহুদিদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিয়েছেন, অথচ আজ দেখতে পাচ্ছি তাদের এত ভালো অবস্থা। এই বিষয়টি কুরআনে সুরা আলে-ইমরানের একটি আয়াতে স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ﴾

তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাক তাদের ওপর লাঞ্ছনার ছাপ মেরে দেওয়া হয়েছে, অবশ্য আল্লাহর তরফ থেকে যদি কোনো উপায় সৃষ্টি হয়ে যায় কিংবা মানুষের পক্ষ হতে কোনো অবলম্বন বের হয়ে আসে, (যা তাদেরকে পোষকতা দান করবে) তবে ভিন্ন কথা।

(সুরা আলে-ইমরান, আয়াত ১১২)

আয়াতের পাঠ থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইহুদিদের লাঞ্ছনা উপশম দুভাবে হতে পারে। এক. আল্লাহর তরফ থেকে। দুই. কোনো মানুষের পোষকতায়।

বর্তমান পৃথিবীর দিকে লক্ষ করলে আয়াতের অর্থ স্পষ্ট। সারা পৃথিবীর এত এত শক্তি ইহুদিদের হাতে থাকার পরেও খ্রিষ্টানদের পোষকতা ছাড়া ওদের কোনো অস্তিত্ব নেই। এবং ওরা কিছুই করতে পারছে না। আর এটাও এক ধরনের লাঞ্ছনারই শামিল। আল্লাহ আলাম। (সম্পাদক)

চেয়েও স্পষ্ট' থাকার বিষয়। ইসলামি বিশ্ব বিশেষত আরববিশ্বে ইসরাইল যে খঞ্জর মেরেছে সেটা তো এই শক্তিরই জানান দেয়। অস্তিত্বহীন ইসরাইল এমন বিশাল শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে যে, আরববিশ্বের কেউই তার পথে বাধা হতে পারছে না। কেউই তার মোকাবেলা করার সাহস করছে না।

এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা মুসলমানদের। সংখ্যায় শত কোটির চেয়েও অধিক হওয়া সত্ত্বেও জাতিগতভাবে তাদের সিদ্ধান্ত কিংবা বক্তব্যেও কোনো প্রভাব নেই। বৈশ্বিক সমস্তকিছুর সিদ্ধান্ত হয় ইউএন এবং তার সিকিউরিটি কাউন্সিলের নামে আমেরিকা ও তার কয়েক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের (যেমন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স) হাতে। আমাদের বড় বড় রাষ্ট্র এবং প্রভাবশক্তির অধিকারী রাষ্ট্রনায়কদের কর্মসূচিও অন্যরা নির্ধারণ করে দেয়। আমাদের আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পলিসিগুলোও অন্য কোথাও থেকে নির্মিত হয়ে আসে। এমনকি রাষ্ট্রীয় বাজেট এবং ট্যাক্সের ব্যাপারেও বাহির থেকে নির্দেশনা আসে। আমাদের মিডিয়া এবং সম্পদশালী রাষ্ট্রগুলোর অর্থকড়িও অন্যের হাতে। যদি একটু তাদের মর্জির এদিক-সেদিক হয় তাহলে সমস্ত সম্পদ আর পুঁজি জমাট করে হাতে থলি ধরিয়ে দেবে। মোটকথা আমাদের বর্তমান অবস্থা একেবারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদবাণী করা সেই হাদিসের মতো, যেখানে তিনি বলেছেন, 'একটা সময় তোমরা সংখ্যায় অধিক থাকা সত্ত্বেও তোমাদের অবস্থা স্রোতে ভেসে যাওয়া খড়কুটার মতো হবে।'[৬]

উল্লিখিত সূক্ষ্ম বাস্তবতাগুলোর পাশাপাশি অতিরিক্ত আরও কিছু বাস্তবতা আমাদের সামনে উপস্থিত। বর্তমান পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত সর্বত্রই মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত। অনেক রাষ্ট্র সুরা নাহলের ১১২ নম্বর আয়াতের ভাষ্য মোতাবেক 'ক্ষুধা ও ভীতির পোশাকে আবৃত'।

---

৬. হজরত সাওবান রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিকট ভবিষ্যতেই এমন এক সময় আসবে, যখন বিশ্বের অন্য জাতিগুলো তোমাদের বিরুদ্ধে হামলে পড়ার জন্য একে অপরকে আহ্বান করবে। যেমন ভক্ষণকারীরা খাবারের দিকে একে অপরকে আহ্বান করে। এক সাহাবি জিজ্ঞাসা করল, তখন কি আমরা সংখ্যায় কম থাকব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, বরং সংখ্যায় সেদিন তোমরা অনেক হবে। কিন্তু তোমরা হবে স্রোতে ভাসা খড়কুটার ন্যায়। শত্রুদের অন্তরে তোমাদের প্রতি কোনো ভয় থাকবে না। তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহান' ঢেলে দেওয়া হবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ওয়াহান কী? তিনি বললেন, দুনিয়ার আসক্তি আর মৃত্যুর ভয়। (সুনানে আবু দাউদ, ৪২৯৭)

আর যেখানে এই দুই অবস্থার কোনোটি নেই; বরং সম্পদ, সড়ক-ব্রীজ, দালানকোঠায় শুধু ইউরোপই নয়, আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হবে, সেখানেও না আছে কোনো সম্মান আর না আছে কোনো ক্ষমতা। আঞ্চলিকভাবেও নেই কোনো স্বাধীনতা।

সুতরাং একদিক দিয়ে লাঞ্ছনা-বঞ্চনা এই পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, পশ্চিমা দেশসমূহের গণমাধ্যম ও পত্রিকাগুলোতে সম্পদশালী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে হাসি-ঠাট্টার পাত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। অপরদিকে অপদস্থতার অবস্থা হলো, ভারতে বাবরি মসজিদ শহিদ করার পর ৫০ থেকে অধিক নামধারী মুসলিম শাসকের কেউই ভারতকে এই কথা বলার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি যে, এখনই মসজিদ পুনর্নির্মাণ না করে দিলে আমরা তোমাদের সাথে কূটনৈতিক নতুবা অন্ততপক্ষে ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক রাখব না। যেন ইজ্জত ও সম্মানের সাথে সাথে আত্মমর্যাদাবোধটুকুও দাফন করে দেওয়া হয়েছে। তাহলে চিন্তা করুন, তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে লাঞ্ছনা আর দরিদ্রতা এবং তারা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়েছে। কুরআনের এই ভাষ্য বর্তমানে নামধারী মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাকি ইহুদিদের ক্ষেত্রে?

সামনে অগ্রসর হওয়ার আগে আরও একটা বিষয় ক্লিয়ার করা দরকার। নতুবা আল্লাহ না করুন হতাশা আর বিষণ্নতা বেশি গভীর হয়ে যাবে এবং কারও কারও অন্তরে কুরআনের বর্ণনার ব্যাপারে সন্দেহ তৈরি হতে পারে। সুতরাং একটা বাস্তবতা উপলব্ধি করা জরুরি যে, বর্তমান অবস্থা মৌলিক ও স্বতন্ত্র কোনো অবস্থা নয়। আরোপিত এবং সাময়িক অবস্থা এটি। আর ভবিষ্যতে এই অবস্থা পুরোই পালটে যাবে ইনশাআল্লাহ। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কোনো জাতির উত্থান-পতনের নীতি আল্লাহর আজাবের দর্শন এবং হাদিস শরিফে উল্লেখিত কেয়ামতের নিকটবর্তীকালে পৃথিবীর অবস্থা ও ঘটনাবলি, ইহুদি-নাসারা ও মুসলমানদের মাঝে সংঘটিত সর্বশেষ যুদ্ধের ব্যাপারে ভবিষ্যদবাণী অনুযায়ী ইহুদিদের ওপর 'আজাবে ইসতেসাল' তথা মূলোৎপাটনকারী শাস্তি পতিত হবে। (এর সুস্পষ্ট বিবরণ সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।) যে বিশাল ইসরাইলি সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দীর্ঘদিন যাবৎ তারা দেখছে সেটা যদিও কিছু সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু অবশেষে সেটাই

তাদের কবরস্থান হবে। (ইনশাআল্লাহ) পুরো বিশ্বব্যাপী উম্মতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই রাজত্ব কায়েম হবে।

বর্তমান নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার (যেটা মূলত 'জিউস ওয়ার্ল্ড অর্ডার' তথা ইহুদিদের বিশ্বব্যবস্থা) সবশেষে ইসলামের জ্যাস্টিজ ওয়ার্ল্ড অর্ডার তথা নবুয়তের আদলে ন্যায় ও ইনসাফের বিশ্বব্যাপী খিলাফা-ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হবে। *সহিহ মুসলিমে* হজরত সাওবান রা. বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ তাআলা আমার সামনে পুরো পৃথিবীকে তুলে ধরেছেন। আমি এর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত পুরো অঞ্চল দেখেছি। নিশ্চয় আমার উম্মতের রাজত্ব সেই সমস্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে, যেগুলো আমার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে।[২৫]

এমনইভাবে *মুসনাদে আহমদে* হজরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ভূপৃষ্ঠে ইট-পশমের এমন কোনো ঘর ও তাঁবু অবশিষ্ট থাকবে না যেখানে ইসলামের কালিমা প্রবেশ করবে না। আর তা সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মানিত করে এবং অপদস্থ ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করে প্রবেশ করবে। হয়তো আল্লাহ তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করিয়ে সম্মানিত করবেন অথবা তাদেরকে ইসলামের অধীনস্থ করে লাঞ্ছিত করবেন।[২৬]

এজন্য আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদবাণীর ওপর বিশ্বাস রেখে হতাশাকে শক্তিতে পরিণত করতে পারি। পাশাপাশি আমরা কেন আজ লাঞ্ছিত, কেন আজ আমরা দুর্দশায় নিপতিত, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কুরআনিক দর্শন অনুযায়ী আমাদের বুঝতে হবে। কারণ একজন সাধারণ মুসলিম স্বভাবতই চিন্তা করবে যে, আমরা কাজেকর্মে-চরিত্রে যতই খারাপ হই না কেন, সর্বাবস্থায় আমরা কালিমা পাঠকারী এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত। তাওহিদের আমানত বহনকারী এবং নবিপ্রেমের দাবিদার। অথচ ইহুদি-নাসারা এবং অন্যান্য জাতি প্রকাশ্য কাফির ও মুশরিক এবং রাসুল

---

২৫. সহিহ মুসলিম, ৭১৫০

২৬. মুসনাদে আহমাদ, ৬৭০১

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকারকারী, তাঁর বিরোধী। সাথে সাথে কুরআন শরিফে বিভিন্ন জায়গায় ঘোষিত হয়েছে, 'আল্লাহ তাআলা কাফেরদের পছন্দ করেন না।' (তবুও কেন আমরা লাঞ্ছিত।) এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সরল চিন্তার মাধ্যমে হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কারণ হলো :

এক. যেভাবে পবিত্র কুরআনে বারবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানে বলা হয়েছে, 'হে মানুষ! যে বিষয় কিংবা আজাবের ধমকি তোমাদের শোনানো হচ্ছে আমি জানি না সেটা অতি নিকটে নাকি দূরে!' (যেমনটা সুরা আম্বিয়ার ১০৯ নম্বর আয়াতে এবং সুরা জিনের ২৫ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।)[২৬] ঠিক এভাবেই এমনটা বলা যাবে না যে, আজাবে ইসতেসাল তথা মূলোৎপাটনের শাস্তির মাধ্যমে ইহুদিদের পতন এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলমানদের উত্থানের মহাবিপ্লব অতি নিকটে নাকি আরও কিছুদিন বিদ্যমান অবস্থা বহাল থাকবে। তা ছাড়া যেহেতু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসসমূহের মাধ্যমে জানা যায়, বর্তমান অবস্থা আরও কঠিন দিকে মোড় নেবে এবং মুসলিমজাতির ওপর আল্লাহর আজাব আরও কঠোর হবে। এজন্য জরুরি হলো, বর্তমান অবস্থার কারণ এবং খোদায়ি আজাবের কুরআনিক দর্শনকে ভালোভাবে আয়ত্ত করে নেওয়া। যেন সুরা শুরার ৩০ নম্বর আয়াত 'তোমাদের ওপর যে শাস্তি অবতীর্ণ হয়, সেটা তোমাদেরই হাতের কামাই'[২৮] অনুযায়ী বাস্তবতা উপলব্ধি হয়। আমাদের বর্তমান অবস্থা

---

২৬. সুরা আম্বিয়ার ১০৯ নম্বর আয়াতটি হলো,

﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ﴾

তবুও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, আমি তোমাদেরকে প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছি। আমি জানি না তোমাদেরকে যে বিষয়ে (অর্থাৎ যে শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা নিকটবর্তী, না দূরে।

আর সুরা জিনের আয়াতটি হলো,

﴿قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا﴾

বলে দাও, আমি জানি না, তোমাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে, তা আসন্ন, না আমার প্রতিপালক তার জন্য কোনো দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করেছেন।

২৮. সুরা শুরার আয়াতটি হলো,

আমাদেরই বেআমল ও বদ আমলের ফলাফল। এভাবে চিন্তা করলে আল্লাহর ব্যাপারে খারাপ ধারণা তৈরি হবে না। বরং নিজেদের ত্রুটির স্বীকারোক্তির সাথে সাথে প্রকৃত বিনয় ও অনুশোচনার অবস্থা তৈরি হবে। যেটা বান্দার তওবার জন্য আবশ্যিক বিষয়।

দুই. যেভাবে কোনো শারীরিক রোগের সঠিক চিকিৎসার জন্য রোগ নির্ণয় অত্যন্ত জরুরি বিষয়। এমনইভাবে উম্মতের বর্তমান দুর্দশার প্রকৃত কারণ নির্ণয়ও খুবই জরুরি বিষয়। যাতে করে আমাদের শক্তি, মেধা ও সময়ের মতো মূল্যবান জিনিসগুলো অনর্থক চেষ্টায় নষ্ট না হয়। বরং আমরা বর্তমান অবস্থার সঠিক উপলব্ধি, উম্মতের দুর্দশার গভীর রহস্য এবং কর্মপদ্ধতির সঠিক অনুভূতি অর্জন করব। অতঃপর তার চিকিৎসার জন্য সঠিক ও বাস্তবিক প্রচেষ্টায় লিপ্ত হব। আরেকটি বাস্তবতা হলো, বর্তমানে আমরা আল্লাহর আজাবে নিপতিত আছি। এর থেকে মুক্তি লাভ করে আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার আঁচলের ছায়ায় জায়গা পেতে হলে আমাদেরকে সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে। ইনশাআল্লাহ!

১২-৪-১৯৯৩

﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾

তোমাদের যে বিপদ দেখা দেয়, তা তোমাদের নিজ হাতের কৃতকর্মের কারণেই দেখা দেয়। আর তিনি তোমাদের অনেককিছুই (অপরাধ) ক্ষমা করে দেন।